5208 - অলসতা করে নামায বর্জন করা

প্রশ্ন

আমি যদি অলসতা করে নামায না পড়ি আমি কি কাফের হিসেবে গণ্য হব? নাকি গুনাহগার মুসলমান হিসেবে গণ্য হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইমাম আহমাদ এর মতানুযায়ী, অলসতা করে নামায বর্জনকারী কাফের এবং এটাই অগ্রগণ্য মত। কুরআন, হাদিস, সলফে সালেহীন এর বাণী ও সঠিক কিয়াস এর দলিল এটাই প্রমাণ করে।[আল-শারহুল মুমতি আলা-যাদিল মুসতাকনি (২/২৬)]

কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহর দলিলগুলো গবেষণা করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, দলিলগুলো প্রমাণ করছে যে, বে-নামাযী ইসলাম নষ্টকারী বড় কুফরিতে লিপ্ত।

এ বিষয়ে কুরআনের দলিল হচ্ছে- “অতএব তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।”[সূরা তওবা, আয়াত: ১১]

দলিলের বিশ্লেষণ হচ্ছে-আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের মাঝে ও আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্তের জন্য তিনটি শর্ত করেছেন: শির্ক থেকে তাওবা করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা। যদি তারা শির্ক থেকে তওবা করে কিন্তু নামায কায়েম না করে, যাকাত প্রদান না করে তাহলে তারা আমাদের ভাই নয়। আর যদি তারা নামাযও কায়েম করে কিন্তু যাকাত আদায় না করে তাহলেও তারা আমাদের ভাই নয়। কেননা কেউ দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে না গেলে তার দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব রহিত হবে না। পাপের কারণে কিংবা ছোট কুফরির কারণে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব রহিত হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: “অতঃপর তাদের পরে এল কিছু অপদার্থ উত্তরাধিকারী, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তারা নয়— যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।”[সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯]

দলিলের বিশ্লেষণ হচ্ছে- নামায নষ্টকারী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “কিন্তু তারা নয়— যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে” এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নামায নষ্টকালীন ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকালীন অবস্থায়

তারা ঈমানদার ছিল না।

বে-নামাযী কাফের হওয়ার ব্যাপারে সুন্নাহর দলিল:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “মুমিনব্যক্তিএবংশির্ক-কুফরেরমাঝেপার্থক্যনির্ধারণকারীহচ্ছে-নামাযবর্জন।” [সহিহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমানে জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন]

বুরাইদা বিন আল-হাছিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমাদেরওতাদের (কাফেরদের) মধ্যেপ্রতিশ্রুতিহলোনামাযের।সুতরাংযেব্যক্তিনামাযত্যাগকরল, সেকুফরিকরল।”[মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ। এখানে কুফর দ্বারা মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী কুফর উদ্দেশ্য। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযকে ঈমানদার ও কাফেরদের মাঝে পার্থক্য নির্ধারক বানিয়েছেন। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায় কাফের সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে গেল। সুতরাং যে ব্যক্তি এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে না সে কাফের।

এ বিষয়ে আওফ বিন মালেক (রাঃ) এর হাদিস রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের নেতাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তোমরা যাদেরকে ভালোবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে, তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তোমরা যাদেরকে অপছন্দ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করে, তোমরা তাদের উপর লানত কর এবং তারাও তোমাদের উপর লানত করে। জিজ্ঞেস করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করব না। তিনি বললেন: না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায কায়েম করে।”

শাসকবর্গ যদি নামায কায়েম না করে তখন তাদের নেতৃত্ব মেনে না নেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করার পক্ষে এ হাদিসে দলিল রয়েছে। শাসকবর্গের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করা বৈধ নয় যতক্ষণ না তারা সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত হয়; যে কুফরি কুফরি হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। যেহেতু উবাদা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন। আমরা তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তিনি যে যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে বাইআত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এর মধ্যে ছিল, সুসময় ও দুঃসময়, আনন্দ ও বিষাদে এবং নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করলেও শাসকের আদেশ শ্রবণ ও আনুগত্য করব। তিনি আরও অঙ্গীকার নিলেন যে, (রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে) আমরা যেন যোগ্য ব্যক্তির সাথে (গদি নিয়ে) বিবাদে লিপ্ত না হই। তিনি বলেন: তবে তখন লিপ্ত হতে পার যদি দেখতে পাও যে, শাসক সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল থাকে”[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] এ হাদিসের ভিত্তিতে

জানা গেল যে, নামায বর্জন করা সুস্পষ্ট কুফরি; যে ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে; যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসকদের সাথে মতভেদ করা ও তাদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করাকে নামায বর্জন করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যদি কেউ বলে যে, এই দলিলগুলোকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা যে, এখানে নামায বর্জন করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- নামাযের ফরযিয়তকে বা আবশ্যকতাকে অস্বীকার করে নামায বর্জন করা।

উত্তরে আমরা বলব: না; এমন ব্যাখ্যা করা জায়েয নয় দুইটি সমস্যার কারণে:

প্রথম সমস্যা: এতে করে শরিয়তপ্রণেতা যে কারণটির সাথে বিধানকে সম্পৃক্ত করেছেন সে কারণটিকে বাতিল করে দিতে হয়। কেননা শরিয়তপ্রণেতা কুফরের হুকুমকে সম্পৃক্ত করেছেন নামায বর্জনের সাথে; নামাযকে অস্বীকার করার সাথে নয়। অনুরূপভাবে দ্বীনি ভ্রাতৃত্বকে সম্পৃক্ত করেছেন নামায কায়েমের সাথে; নামাযের ফরযিয়তে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে নয়। আল্লাহ্ তাআলা এ কথা বলেননি যে, যদি তারা তওবা করে এবং নামাযের ফরযিয়তের স্বীকৃতি দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি যে, “মুমিনব্যক্তিএবংশির্ক-কুফরেরমাঝেপার্থক্যনির্ধারণকারীহচ্ছে- নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকৃতি।” কিংবা তিনি এ কথাও বলেননি যে, “আমাদেরওতাদের (কাফেরদের) মধ্যেপ্রতিশ্রুতিহলোনামাযের ফরযিয়তের স্বীকৃতি।সুতরাংযেব্যক্তিনামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করল,সেকুফরিকরল।” যদি এর দ্বারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের উদ্দেশ্য হত নামাযের ফরযিয়তের অস্বীকৃতি; তাহলে এভাবে উল্লেখ না করে অন্যভাবে উল্লেখ করায় সেটা স্পষ্ট বিবৃতি হত না; যে স্পষ্ট বিবৃতি নিয়ে কুরআন আগমন করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৮৯] আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন: আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৪৪]

দ্বিতীয় সমস্যা: এমন একটি কারণকে বিধানের সাথে সম্পৃক্ত করা শরিয়তপ্রণেতা যেটাকে বিধানের সাথে সম্পৃক্ত করেননি। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি যদি অজ্ঞতার কারণে যাদের ওজর গ্রহণযোগ্য এমন শ্রেণীর লোক না হয় তাহলে অস্বীকারের কারণেই তার কুফরী সাব্যস্ত হবে; চাই সে নামায আদায় করুক কিংবা নামায বর্জন করুক। যদি ধরে নিই, এক ব্যক্তি নামাযের যাবতীয় শর্ত, রুকন, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পরিপূর্ণ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছে; কিন্তু সে কোন প্রকার ওজরগ্রস্ত না হয়েও নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করে— সে ব্যক্তি কাফের; অথচ সে নামায বর্জন করেনি। এতে করে জানা গেল যে, এ দলিলগুলোকে নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করার অর্থে গ্রহণ করা— সঠিক নয়। সঠিক অভিমত হচ্ছে- নামায বর্জনকারী কাফের; এমন কাফের যে কুফরি ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কার করে দেয়। ইবনে আবু হাতিম কর্তৃক সংকলিত ‘সুনান’ গ্রন্থে উবাদা বিন সামেত এর হাদিসে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ওসিয়ত করে গেছেন

আমরা যেন আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত না করি, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন না করি, কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন করবে সে ব্যক্তি (মুসলিম) মিল্লাত থেকে বেরিয়ে যাবে।”

এ ছাড়া আমরা যদি এ দলিলগুলোকে নামাযের ফরযিয়তকে অস্বীকার করার অর্থে গ্রহণ করি তাহলে এ দলিলগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নামাযকে উল্লেখ করার তো কোন অর্থ থাকল না। কারণ এই হুকুম তো যাকাত, সিয়াম, হজ্জ এগুলোর ক্ষেত্রেও আম। কেউ যদি ফরযিয়তকে অস্বীকার করে এ আমলগুলোর কোন একটিকে বর্জন করে; সে যদি অজ্ঞতার কারণে যাদের ওজর গ্রহণযোগ্য এমন শ্রেণীভুক্ত না হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

নামায বর্জনকারীর কাফের হওয়া যৌক্তিক দলিলেরও দাবী; যেমনটি শ্রুত দলিলের দাবী। কিভাবে কোন ব্যক্তির ঈমান থাকবে যদি সে দ্বীনের মূল ভিত্তি নামাযকেই বর্জন করে। অথচ নামাযের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকারী এমন কিছু দলিল এসেছে, যেগুলোর দাবী হচ্ছে- প্রত্যেক আকলসম্পন্ন ঈমানদার নামায আদায় করবে, এক্ষেত্রে কোন গড়িমসি করবে না এবং নামায বর্জনের ব্যাপারে এমন কিছু দলিল এসেছে যেগুলোর দাবী হচ্ছে- প্রত্যেক আকলসম্পন্ন ঈমানদার নামায বর্জন করা থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং দলিলের এমন দাবী প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নামায বর্জন করলে সে বর্জনের সাথে আর ঈমান থাকে না।

যদি কেউ বলে: নামায বর্জনকারীর কুফরি দ্বারা নেয়ামতকে কুফর করা তথা নেয়ামতকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নেয়া যায় না? কিংবা বড় কুফরকে উদ্দেশ্য না নিয়ে ছোট কুফরকে উদ্দেশ্য নেয়া যায় না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ বাণী মত: “মানুষের মাঝে দুইটি কুফরি রয়েছে। একটি হচ্ছে- বংশের উপর অপবাদ দেয়া ও মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ করা” এবং ঐ বাণীর মত: “মুসলমানকে গালি দেয়া পাপের কাজ; আর মুসলমানের সাথে লড়াই করা কুফরি” এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদিস?

আমরা বলব, এমন ব্যাখ্যা করা নিম্নোক্ত কারণে সঠিক নয়:

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফর ও ঈমানের মাঝে এবং ঈমানদার ও কাফেরদের মাঝে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে সীমারেখার কারণে নির্ধারিত বিষয়ের একটি অপরটি থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তাই নির্ধারিত বিষয়ের একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

২। নামায হচ্ছে ইসলামের অন্যতম একটি রোকন। তাই নামায বর্জনকারীকে কাফের বলার দাবী হচ্ছে এ কুফর ইসলাম নষ্টকারী কুফর। কেননা নামায বর্জনকারী ইসলামের একটি রোকনকে ধ্বংস করছে। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তির কুফরি কাজকে কুফরি বলা— এ রকম নয়।

৩। এছাড়া আরও কিছু দলিল রয়েছে যে দলিলগুলো প্রমাণ করে যে, নামায বর্জনকারী কাফের, মুসলিম মিল্লাত থেকে

বহিষ্কৃত। যাতে করে, দলিলগুলো একটি অপরটির সাথে খাপ খায়, সাংঘর্ষিক না হয়।

৪। নামায বর্জনকারীর ক্ষেত্রে যখন কুফর বলা হয়েছে তখন كفر শব্দের শুরুতে الْ যুক্ত করে الكفر বলা হয়েছে। ال যুক্ত করে الكفر বলাতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে কুফর দ্বারা এর হাকীকী বা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে, نكرة এর শব্দ হিসেবে এর كُفْرٌ শব্দের ব্যবহার কিংবা فعل হিসেবে كَفَرَ শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি কুফরি কিংবা সংশ্লিষ্ট কাজটির মাধ্যমে সে ব্যক্তি কুফরি করেছে। কিন্তু, এ কুফরি মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী কুফরি নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর রচিত 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম' গ্রন্থে (৭০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: اثنتان في الناس هما بهما كفر (অর্থ- মানুষের মধ্যে দুইটি অভ্যাস রয়েছে; যে দুইটি কুফরি) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: তাঁর বাণী: هما بهما كفر এর অর্থ এ দুইটি খাসলত বা অভ্যাস মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কুফরি। যেহেতু এ অভ্যাস দুইটি কুফরি যামানার কর্ম; তাই এ অভ্যাসদ্বয় কুফরিকর্ম। এ দুইটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তবে, কারো মধ্যে কুফরির কোনো একটি শাখা বিদ্যমান থাকলে এর অর্থ এ নয় যে, সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে প্রকৃত কুফরি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কারো মধ্যে যদি ঈমানের কোনো একটি শাখা পাওয়া যায় এর দ্বারা সে ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমানের মৌলিক বিশ্বাস ও হাকীকত পাওয়া যায়। الْكُفْرُ শব্দটি ال দিয়ে ব্যবহৃত হওয়া যেমন হাদিসে এসেছে- " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة", এবং نكرة হিসেবে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হওয়া এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরিষ্কার হলো যে, এই দলিলগুলোর দাবী হচ্ছে- কোনো ওজর ছাড়া নামায বর্জনকারী ইসলাম ত্যাগকারী কাফের। সুতরাং ইমাম আহমাদের অভিমতই সঠিক এবং ইমাম শাফেয়ির দুই অভিমতের একটি অভিমতও এটা। ইবনে কাছির (রহঃ) তাঁর তাফসির গ্রন্থে আল্লাহ্‌র বাণী: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ(অর্থ-তাদের পরে এল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল)[সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯]এর তাফসির করার সময় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর 'আস-সালাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এটি শাফেয়ি মাযহাবের দুইটি অভিমতের একটি। ইমাম তাহাবি ইমাম শাফেয়ি থেকে এ অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন।

জমহুর বা অধিকাংশ সাহাবীর অভিমতও এটাই। বরং কেউ কেউ এ মতের উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন শাকিক বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল বর্জন করাকে কুফরি হিসেবে দেখতেন না।"[সুনানে তিরমিযি, মুসতাদরেকে হাকেম এবং হাকেম বলেছেন, এ বাণীটি সহীহাইনের শর্তে উত্তীর্ণ] প্রসিদ্ধ ইমাম ইসহাক বিন রাহুইয়া বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ সনদে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নামায বর্জনকারী কাফের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকে আমাদের সময়কাল পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আলেমদের অভিমত যে, কোনো ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জনকারী; নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে

গেলে— কাফের। ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, এ মতটি উমর (রাঃ), আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ), মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আরও বলেন: আমরা এ সাহাবীদের সাথে মতবিরোধকারী কোন সাহাবীর কথা জানি না। মুনযিরি তাঁর তারগীব ও তারহীব নামক গ্রন্থে এ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি আরও কিছু সাহাবীর নাম বৃদ্ধি করেন। তাঁরা হচ্ছেন- আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ), জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ), আবুদ দারদা (রাঃ)। তিনি আরও বলেন: সাহাবী ছাড়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইসহাক বিন রাহুইয়া (রহঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহঃ), নাখায়ি (রহঃ), আল-হাকাম বিন উতাইবা (রহঃ), আইয়ুব আল-সখতিয়ানি (রহঃ), আবু দাউদ আত-তায়ালসি (রহঃ), আবু বকর ইবনে আবু শাইবা (রহঃ) ও যুহাইর বিন হারব (রহঃ) প্রমুখ।[উদ্ধৃত সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।